Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 124 - 132
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অভিজিৎ সেনের ছোটোগল্পে প্রেম ও যৌনতা প্রসঙ্গ

ড. ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: sourav.2347@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Abhijit Sen, Short Stories, Village, City, Love, Sex, Character, Analysis.

Abstract
Abhijit Sen's stories often feature a wide range of love and sexuality between characters created in rural Bengal or urban stories. By the time he entered the literary world, Romanticism had assumed a large role in institutional journals. Starting from urban manners, the crowd of handsome and beautiful heroines, college love, sky-high fantasy, many have accepted the commentary. In addition to this, while painting the picture of the period of destruction, people's treachery, suspicion, violence, the struggle to establish rights, as the previous writers have painted the passions of people in a different way, in the same way Abhijit Sen uses his vast experience and his own mentality in his short stories 'Love' and 'Sex'. Despite keeping the topic under wraps, he didn't keep too much under wraps.

Discussion

শুধুমাত্র মানুষের প্রতি মানুষের অগাধ প্রেম ও মিলনান্তক পরিণতিকে অভিজিৎ সেন এড়িয়ে গেছেন অনেকাংশে। তবে একথাও ঠিক, পারস্পরিক বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে প্রেম ও যৌনতাকে একসঙ্গে চালিত করেছেন একাধিক ছোটোগল্পে। সমালোচকের মতে—

> "অভিজিৎ সেন তাঁর ছোটোগল্পে উপনিবেশিক বয়ানের বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের আধিপত্যাধীন মানুষের উপযোগী এক বয়ান গড়ে তুলতে প্রয়াসী। প্রেমের গল্পে তিনি শরীরকে উপেক্ষা করেননা, আবার সে গল্পের বয়ানও লোক-বিশ্বাস, বর্তমান সময় কিংবা সমাজ-ইতিহাসকে মিলিয়ে মিশিয়ে গড়ে তোলেন।"[১]

লেখক অভিজিৎ নিজেই স্বীকার করেন—

> "Sex বা যাকে বাংলায় বলা হয় যৌনতা এবং Violence বা হিংস্রতা (যা ক্রোধের পরিণতি), এই দুই প্রধান রিপুর প্রভাবে মানুষকে যেমন ভাবে চেনা যায়, তেমন বোধহয় অন্য কোনো রিপুর বেলায় হয় না।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিজিৎ সেনের এই বক্তব্যকে আমরা আধার করে বলতে পারি, প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে পরিচিত চেনা ছককে ভেঙে, অভিজিৎ সেন যে সমস্ত গল্প লিখেছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব এই ধরনের গল্পগুলির বিশেষত্ব।

'ফাল্গুনি রাতের পালা' গল্পে কথক ও মহিপদর বাঁশুরি নামক জায়গায় ঋণের টাকা আদায় করতে যাওয়ার ঘটনা এক অদ্ভুত দ্বান্দ্বিক মোড় নেয়। মহিপদ আগেও বাঁশুরি গেছে এবং গোপনে সেখানে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে আর তার দায়িত্ব স্বীকার করেনি কোনো সময়। ঘটনাক্রমে মহিপদর অস্বীকৃত সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা। বিবাহের জন্য যে টাকা দরকার, বাঁশুরি গ্রামের মহিপদর মেয়ের মা নমিতার সেই টাকা নেই। এই অস্বীকৃত যৌন সম্পর্ককে বর্ণনা করতে মহিপদর স্বভাব বৈশিষ্ট্যে আলোকপাত করেন লেখক। মহিপদ অসংযমী, নিষ্ঠুর ও যৌন লালসায় বিকৃত একজন মানুষ। তাই সে বলে—

> "দেখ নদীর যখন ভরা যৌবন, তখন আশপাশে যা পারে, গিলে ফেলবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর এখন দেখ, মাসিক বন্ধ হওয়া শুঁটকো মেয়ে মানুষের মতো কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে।"[৩]

পথচলতি আদিবাসী মেয়েদের দল দেখে লালায়িত হয়ে পড়ে মহিপদ। নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র আলাপ-পরিচয়ে মগ্ন হয় এমন নয়, দলের সবথেকে সুন্দরী আদিবাসীটিকে সে যে কোনো মুহূর্তে ভোগদখল করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখে, এমনকি কথককে পাইয়েও দিতে পারে সেই সুন্দরী রমণীটিকে— এমন ক্ষমতাধর বলে নিজেকে জাহির করে সে।

গোপাল মণ্ডল ও কথকের মিলিত পরিশ্রমে মহিপদ শেষ পর্যন্ত বাঁশুরি পৌঁছয়। আর সেখানে তার ফেলে আসা প্রেমিকা, অস্বীকৃত মেয়ের মা নমিতা মধ্যরাতে মহিপদর কাছে আসে। নমিতার হাহাকার গল্পে বর্ণিত হয় এভাবে—

> "—উঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর! মানুষ মানুষের এমন সর্বনাশ করে না যেমনটি তুমি আমাদের করেছ। তুমি শয়তান, ঠগ, জোচ্চর। আমার সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে, বাকি জীবনও জ্বলবার জন্যই পড়ে রয়েছে! কেন, কেন আমাকে এভাবে ঠকালে?"[৪]

কিন্তু নমিতা মহিপদকে অস্বীকার করতে পারে না। মহিপদর কাছে সর্বস্ব দিয়ে ফের একবার আত্মসমর্পণ করে নমিতা। মহিপদ সম্ভোগ করে নমিতাকে। কথকের বয়ানে আমরা শুনতে পাই—

> "আমার এতকালের একটা ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। যৌন আবেগে মেয়েরা তাহলে পুরুষের থেকেও দুর্বল। অথচ তাদেরই এতকাল বেশি রক্ষণশীল বলে জেনে এসেছি। আর পুরুষ মানুষ তো খাটিয়া, কলাগাছা, দরমার বেড়া কাউকে ছাড়ে না, নমিতা তো সুন্দরী স্ত্রীলোক।"[৫]

নমিতা হেরে যায়। মহিপদর কাছে টাকা আদায়ের যে চেষ্টা বহুযত্নে গোপাল মণ্ডল ও কথক করেছিল সে গোপন পরিকল্পনা নমিতা মহিপদকে বলে দেয়। আর পরদিন সকালে তাই গোপাল মণ্ডল বা কথক বা কেউই মহিপদকে আর খুঁজে পায় না।

মহিপদকে ফের আমরা খুঁজে পাই শহরের অফিসে। জানতে পারি, গোপাল মণ্ডল আর কথকের হাত থেকে বাঁচতে মহিপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল নমিতার ঘরকেই, নমিতাকেই। এমনকি সেখান থেকে বেরিয়ে সে গেছিল ভিখাডাং। এমনকি সেই আদিবাসী নারীর দলের সবচেয়ে সুন্দরীটিকে সে সম্ভোগ করেছে সেখানে। মহিপদর দাম্ভিক উক্তি আমাদের অবাক করে—

> "মহিপদ হাসল। বলল, তুমি ভারি ছেলেমানুষ। আমি বললে নমিতা কুঁয়োয় ঝাঁপ দেবে, জানো?"[৬]

নমিতার প্রেম ও যৌনতা, মহিপদর প্রেম ও যৌনতা পরস্পর পরস্পরের বিপরীতে এইভাবেই এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। সমালোচকের তাই মন্তব্য—

> "গল্পে যৌনতা কখনো মায়া কুহক রচনা করে চরিত্রের সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছে। এইসব চরিত্রগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব ও প্রবৃত্তি তাড়না গল্প আবহতে আদিম এক অন্ধকারকে আমন্ত্রণ জানায়। আর মানুষের প্রবৃত্তিত লালসা রূপায়নে অভিজিৎ অনেকটা প্রকৃতিবাদী শিল্পীর মতোই প্রত্যক্ষ, নির্মোহ ও নির্মম।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নমিতার এই আত্মনিবেদন ও কমবেশি জীবনের সঙ্গে এই হঠকারিতার দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই, 'বদলি জোয়ানের বিবি' গল্পের জানকীর মধ্যে। সীমান্তে জানকী একজন স্ত্রী, ঘরণী। কিন্তু তার ঘর বদলে যায় বারবার। সীমান্তের এক একজন প্রহরী এক একসময় নেহাৎ শরীরী চাহিদা মেটাতে জানকীকে ভোগ করে, দখল করে। ফলে জানকী হয়ে ওঠে 'বদলি বউ'। তার প্রথম সংসারের মানুষ নিহাল তাকে ছেড়ে যায়। অথচ—

> "কী আশ্চর্য! লোকটা কি ভয়ানক ভালোবাসতে পারত! অথচ যাওয়ার সময় কী অক্লেশে জানকীর ফুঁপিয়ে ওঠা মুখের চিবুক দু-আঙুলে তুলে হা হা করে হেসে উঠেছিল। পাগলী কোথাকার, নিহাল যাবে, ঘর ঠিক করবে, আর এসে তাকে নিয়ে যাবে। এতে কান্নার কী আছে? নতুন জায়গায় মেয়েলোক নিয়ে হাজির হলেই হল? এ কী কেরানির চাকরি? এ হল বি.এস.এফ জোয়ানের ডিউটি।"[৮]

নিহালের পর সে হয়, কমবেশি হতে বাধ্য হয় চিরঞ্জীলালের ঘরণী। নিহাল ও চিরঞ্জীলাল পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। একজন যৌবনের প্রতীক, অন্যজন ধীর-স্থির-সংযমী। কিন্তু চিরঞ্জীলালও শেষপর্যন্ত ছেড়ে যায় জানকীকে। ইতোমধ্যে জানকী একা নয়, নিহালের অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি কন্যাসন্তানের মা-ও সে। 'বদলি বউ' এই অভিধায় তাকে আমরা আরও খুঁজে পাই, যখন দুজনেই তাকে ছেড়ে দেয়। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য সে কখনও নামদেও, কখনও সূরজের বউ হয়ে ওঠে। আর গল্পে পাঁচ বছর পর চিরঞ্জীলাল ও নিহাল একসঙ্গে ফিরে এলে, সমস্ত কিছু ভুলে জানকী বেছে নেয় নিহালকে। জানকীর অন্তর্গহনের যে পরিস্থিতি, স্পষ্ট করেন লেখক এভাবে—

> "সব যেন জাদুকরের মায়াবী দণ্ড স্পর্শে হওয়া জ্বলন্ত তরল রক্ত এখন তার ধমনীতে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি বিন্দু স্পর্শ এবং প্রবল বেষ্টনের আশ্লেষে একেবারেই নির্লজ্জ ও বেপথু। সবকিছু এই মুহূর্তেই চায়, এমন একটা জানোয়ারী হর্ষ যেন তার স্নায়ুতে, ধমনীতে, সর্বাঙ্গে।"[৯]

এই 'জানোয়ারী হর্ষ' আর 'জাদুকরের মায়াবী দণ্ড'-এর একত্র অবস্থান শেষপর্যন্ত তাই নিহালকে জিতিয়ে দেয়। বৃদ্ধ চিরঞ্জীলাল হেরে যায় নিহালের, জানকীর যৌবনোচিত স্বভাবধর্মেই। এমনকি জানকী মুহূর্তের জন্যও ভাবে না তার সন্তানের কথা। জানকীর শিশুকন্যা ভবিষ্যতে আর এক 'বদলি জোয়ানের বউ' হয়ে উঠবে কিনা সেই প্রশ্নই অমীমাংসিত হয়ে থাকে গল্পের শেষে।

শরীরকে উপেক্ষা করেননি অভিজিৎ সেন, যার ফলশ্রুতি 'মানবদেহের গৌরব' গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি শরীর বাদেও যে নিভৃত সম্পর্ক, সে আত্ম অনুভবকেও গল্পের শেষে পরিস্ফুট করেন অভিজিৎ সেন। বিধবা মিলন ও তার যুবতী মেয়ে সুলেখা বারংবার তাই বহুভোগ্যা হয়ে ওঠে একের পর এক মানুষের কাছে। মিলনের সংসার ভাগ্য যেমন সুখের নয় তেমন শান্তিরও নয়। অফুরন্ত যৌবনবতী মিলনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ভোগ করে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী, তার খুড়শ্বশুর, ধনী ব্যবসায়ী অক্ষয় সা প্রত্যেকেই। আর প্রত্যেকবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিলনের সঙ্গে জোর জবরদস্তি 'মিলন'-এর সম্ভাবনায় তাই বারবার ফিরে আসে আগুনের উপস্থিতি। পাশাপাশি আমরা আবিষ্কার করি মিলনের স্বামীকেও। আমরা তাকে পাই নেশাগ্রস্ত, ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মেলায় আগত পতিতা সমেত এক হতভাগ্যের মতো মৃত্যুবরণে। মিলনের দীর্ঘ বাইশ বছরের সংগ্রাম, পাশাপাশি তার মেয়ে সুলেখার বয়সোচিত ধর্মে ক্রমশ কাঙাল হয়ে ওঠা, শুধুমাত্র তাদেরকে 'মা-মেয়ে' এই সম্পর্কে আবদ্ধ রাখে না। পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগীও হয়ে ওঠে কিছুটা। মিলন তাই সহজেই নিজের মেয়েকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে পারে, আর সুলেখাও তার মাকে প্রত্যুত্তর দিতে পারে সমানে। মিলনকে দেখে অক্ষয় সা-র তাই মনে হয়—

> "মিলনের পিছন তার সামনে। মাত্র দেড়-দুহাত তফাতে। পিছন থেকে তার দেহের বেড় দেখতে দেখতে অক্ষয় সার হঠাৎ মনে হল কেন একদিনও কাউকে কাটল না সাপটা? থলি ভর্তি এত বিষ! ... তার হঠাৎ খুব ইচ্ছা হল পিছন থেকে মিলনের দুই উত্তুঙ্গ বুকে দুহাত রাখে সে, তারপর নিজের দেহের সঙ্গে টেনে এনে ঘাড়ের উপরে, কানের লতিতে চুম্বন করে।"[১০]

আর সুলেখার নতুন প্রেমিক সুকুমার যখন বিয়ে করতে রাজি হয়না সুলেখাকে, তখন সুলেখার আর্তি, আর্তনাদে পরিণত হওয়ার ছবি পাই এভাবে—

> "সুলেখা অতি দুর্বল পুরনো খেলাটা খেলেছে। তাতে সুকুমার উঠে তার প্যান্টটা পরতে যেতে সুলেখা কাঙালের মতো বলেছিল, একবার মিথ্যা করেও বল না যে বিয়ে করবে!"[১১]

আমরা বুঝতে পারি, সমাজ এই দুজনকে একরকমের যৌন পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে গেছে আদি অন্তহীন ভাবে। আর সেখানে 'আগুন' বারবার ফিরে এসেছে তাদের ব্যর্থ বিদ্রোহের প্রতীক হয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আগুনেই গল্পের অন্তিম পরিণতি ঘনিয়ে আসে। সুলেখা গায়ে আগুন দেয়। সুলেখাকে বাঁচাতে তার মা মিলনও অগ্নিদগ্ধ হয়। সাতাশ বছরের সুলেখার সর্বাঙ্গ আগুনে পুড়ে যায়। পুড়ে যায় তার মাথার চুল, বিকলাঙ্গ বালক ভিখারির মতো একটা পুঁটলি হয়ে বসে থাকে সে। কিন্তু তার পরেও সে বলে ওঠে—

> "রেবার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে উঠল, 'হাঁ—করে দেখছিস কী? আলনা থেকে একটা কাপড় দে' তার জীবনের যেন একটা কাজই বাকি ছিল।"[১২]

আর পিঠ ও নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া মিলন সুলেখার সঙ্গে হাসপাতালের গাড়িতে ওঠে আর সেখানেই গল্প শেষ হয় এভাবে—

> "মিলন হেঁটেই গাড়িতে গিয়ে উঠল। তার পিঠ এবং নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। শুধু অক্ষত আছে তার অনিন্দ্য দৃঢ় বুক জোড়া, গলির দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীপুরুষ, সবার কাছে যা এখনো প্রবল ঈর্ষা, আকর্ষণের এবং আতঙ্কের।"[১৩]

সমালোচক গল্পের এই জায়গাটিকে যথার্থ ইঙ্গিত করে লিখেছেন—

> "যৌনতার কারণেই মিলন ও সুলেখা পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল। একে অপরকে শিকার করে ফিরেছিল। গল্পের শেষ পর্বে দুই নারীর রূপের গর্ব যখন আগুনে ঝলসে গেছে তখন দুই নারী পাশাপাশি এসেছে মা ও মেয়ের সম্পর্কের সত্যকে স্বীকার করে। রূপের গৌরব, যৌনতার দাবি কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তা সমসাময়িকভাবে মানুষকে আবিষ্ট করে। সত্যের কাম থেকে বিচ্যুত করে। যে বিচ্যুতি অনেক বড় মুল্যের বিনিময়ে মেটাতে বাধ্য হয়েছিল মিলন ও সুলেখা।"[১৪]

দেহকে মাটির ভাণ্ড রূপে স্বীকার করা যুগযুগান্ত ধরে আমাদের যে সহজিয়া দার্শনিকতা, গানকে আধার করে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে প্রেমভাবনা, সেই প্রেমভাবনা পরিস্ফূট হয়েছে 'দেহাত্মতত্ত্ব' ও 'তুলসীমালা' গল্পে সোনামণি দাসী ও তুলসীর মধ্যে। সোনামণি দাসীর পরিচয় হিসেবে আমরা পাই—

> "সোনামণি দাসি আমাদের লাইনে বিশিষ্ট শিল্পী। একাধিক কারণে এ লাইনের লোকেরা তাকে সবথেকে বেশি পছন্দ করে। এই কারণগুলো হল, অপরিমেয় দারিদ্র্য সত্ত্বেও তার চেহারাটি অটুট, তার বয়স তিরিশ বত্রিশের মধ্যে, তার কণ্ঠস্বরটি সুরেলা এবং তাল-লয়-মাত্রা সাপেক্ষ।"[১৫]

কিন্তু পৃথিবীতে এর বিপরীত চরিত্রও বর্তমান, যেমন রবি। কথকেরই সহযাত্রী এবং সে-ও সোনামণির প্রতি মুগ্ধ, তবে সেই মুগ্ধতা কথকের মতো সম্পূর্ণ গুণমুগ্ধতা নয়। রবির চরিত্রের একটি বিশেষ দিক কথক সামান্য ইঙ্গিতেই উদ্ভাসিত করেন। ট্রেনের লাইনের পাশে একজোড়া তরুণ-তরুণী পরস্পর কাছাকাছি থেকে কথা বললে রবির চরিত্র উদ্ভাসিত হয় এই ভাবে—

> "ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর রবি। লাইনের পাশে একজোড়া তরুণ-তরুণী কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। চলন্ত গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে রবি ছেলেটির উদ্দেশে বলল, 'আরে হারামজাদা কথা বলছিস কী? পেড়ে ফেল, শুইয়ে ফেল সময় নষ্ট না করে।' "[১৬]

কিন্তু সোনামণি গুণের কদর করা কথকের দর্শনেই বিশ্বাসী। তাই ঘটনাচক্রে রেললাইনের পাথরে সোনামণির পা কেটে গেলে কথক যখন সেই পায়ের শুশ্রূষা করে, তখন সোনামণি আনন্দে কেঁদে ফেলে। বস্তুত, সোনামণির 'গোঁসাই', গল্পের কথকও একজন গুণী শিল্পী। ফলে গুণের প্রকৃত সমঝদারও তিনি। আর তাই সোনামণি দাসীর কাছে কথক নিজের অজান্তেই দোতারা তুলে নিতে পারেন খুব সহজে এবং সামান্য আয়াসে পুরনো গানের সুর ফিরিয়ে আনতে পারেন আঙুলের কারসাজিতে। সোনামণি দাসীর অনুরোধে গেয়েও ফেলেন সেই গান—'আমার গোঁসাই বিনে দরদী কাঁয় আছে কাও নাই

রে'। পরের গান হিসাবে বেছে নেন লালন সাঁইয়ের 'এ বড় আজব কুদরতি—'। সোনামণি লালনের সেই গান নিজের কণ্ঠে ধারণ করলে কথক বোঝেন—

> "তারপর যখন একখানা একতারা হাতে নিয়ে গাইল আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম তার গাওয়া গানের মেলডি আমার শেখানো সুরতান থেকে পৃথক হয়ে পৃথক মাত্রা পেয়েছে। যেহেতু সে স্বভাবসুকণ্ঠী, গানটি ঘিরে নতুন মোহ বিস্তার হতে লাগল। একটুকরো কাগজে গানটি লিখে দিলাম সোনামণিকে।"[১৭]

এই একই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই 'তুলসীমালা' গল্পে। অনতিক্রম্য কামকে অতিক্রম করলে, শেষ পর্যন্ত সেই কাম কীভাবে প্রেমে রূপান্তরিত হয় আর পাওয়া যায় অচিন্ত্য এক নতুন জীবনের সন্ধান, সেই গল্পই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তত্ত্বমূলক এই আখ্যানে। শ্রীপাট নিহিনগরের মহান্ত দেবকী দাস যখন দেহ রাখে আটচল্লিশ বছর বয়সে, তখন তার সাধনসঙ্গিনী তুলসীর বয়স সাতাশ। প্রেমতত্ত্বের গল্প হলেও এইখানে মিশে রয়েছে এক সূক্ষ্ম রাজনীতি ও অধিকারতত্ত্ব। মহান্ত জীবিত থাকাকালীন তুলসীমালার সেই শ্রীপাটে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলেও মহান্তের প্রয়াণের পর তুলসীমালা কিছুটা হলেও বুঝতে পারে তার প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তমিত হয়ে যেতে পারে যে কোনো ভাবে। তাই শবদেহ আগলে বসে থাকে তুলসীমালা।

কিন্তু দুদিন পর মহান্তের শবদেহ থেকে কটুগন্ধ বের হতে থাকে। ধূপকাঠির সংখ্যা যথেচ্ছ বৃদ্ধি করলেও সেই দুর্গন্ধ আটকানো যায় না কিছুতেই। আর তৃতীয় দিন রাত দশটার পর উঠোনে চাঁদোয়ার নিচে নতুন এক গলার গান তুলসীমালাকে আকৃষ্ট করে। 'দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রংগিলা দালানের মাটি গোঁসাই হে'— এই গান ধ্বনিত হতে থাকলে তুলসীমালার অন্তঃপুরে ঝড় ওঠে। সজাগ ইন্দ্রিয় নিয়ে অপেক্ষা করে তুলসীমালা গায়কের জন্য। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, গায়ক তুলসীমালার পূর্বপরিচিত রাধামোহন দাস। মধ্যরাতে তুলসীমালার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ে রাধামোহন। তাদের পারস্পরিক সংলাপে উঠে আসে তৃষ্ণা নিবারণের কথা। তবে এই তৃষ্ণা কি শুধুমাত্রই জলের চাহিদাই?—

> "মাঝরাতে দরজায় ঠুকঠুক করে আঘাত হতে সে উঠে বসল। ঘরের মধ্যে একপাশে দেবকী দাসের শব, এখন প্রবল দুর্গন্ধের আধার। সেদিকে একবার তাকিয়ে তুলসীমালা জিজ্ঞেস করল, 'কে? কে কড়া নাড়ে?'
>
> 'আমি গো তুলসীমালা। আমি রাধামোহন দাস। দরজাটা একবার খোলো।'
>
> দরজা খুলল সে।
>
> 'কী ব্যাপার?'
>
> 'বড় তিয়াস লেগেছে। বাইরের টিউকলটার হাতল ভেঙে গেছে। এক ঘটি জল দেবে গো?'
>
> একঘটি জল দিয়ে দরজা ফের বন্ধ করল তুলসীমালা।"[১৮]

ভোররাতে ফের জল নিতে রাধামোহন তুলসীর ঘরে আসে। মানবদেহ মাটির ভাণ্ড, ভেঙে খানখান হয়ে যায়। এমন কোনও রসায়ন নেই যে তাকে জোড়া লাগায়। জাত বোষ্টমের মেয়ে তুলসীকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় রাধামোহন। রাধামোহন আরও বলে—

> "'চামের ছাউনির নিচে মনুষ্যদেহ পাখির খাঁচা। খাঁচার ভিতরে থাকে পাখি। যতক্ষণ পাখি আছে, ততক্ষণই দেহের লীলাখেলা। পাখি ফুড়ুৎ, বাস, ও দেহ তখন পচা কুমড়ার থেকে ত্যাজ্য। কুমড়োর খোলে তবু একখানা একতারা হবে, ও দেহ দিয়ে কিছু হবার নয় গো, তুলসীমালা।' "[১৯]

রাধামোহনের এই কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় তুলসীমালা। শেষ পর্যন্ত মহান্তর শবদেহ সেইখানেই সমাধির ব্যবস্থা করে তুলসীমালা। আশ্রয়চ্যুত তুলসীমালা এতকিছু বোঝার পরেও আশ্রয় চায় ফের। রাধামোহনকে থেকে যেতে বলে সেখানে। আর শঙ্কায়, কখনও কোনোদিন না ছেড়ে যেতে বলে রাধামোহনকে। গল্পের শেষে বৈষ্ণবতত্ত্ব, বৈষ্ণবপ্রেম আখ্যায়িত হয় রাধামোহনের ভাষ্যে—

> "রাধামোহন দাস ভেঙে-পড়া তুলসীমালাকে হাত ধরে তুলল। বলল, 'বৈষ্ণবের জীবনে এই পৃথিবী সত্য, ইহলোকই সব, তুলসীমালা। আর সত্য কৃষ্ণ প্রেম। হরে কৃষ্ণ।' "[২০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দেহাত্মতত্ত্ব' ও 'তুলসীমালা' আসলে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক গল্প, একথা এই দুই গল্পের আলোচনা শেষে আমরা স্বীকার করতেই পারি।

আবার মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা, মানুষের অন্তর্গহনে সযত্নে লালিত 'ফ্যান্টাসি' কীভাবে ডেকে আনে এক দুরূহ জগতের হাতছানি তার পরিচয় মেলে 'স্ফিংকস' গল্পে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় 'স্ফিংকস' একাধারে এক স্থাপত্য ও একাধারে এক দর্শন বিশেষ। স্ফিংসের আকৃতি সিংহমানবীর মতো। এর মুখ একজন নারীর এবং শরীর একটি পশুর। অভিজিৎ সেনের 'স্ফিংকস' গল্পে এক মানবীর আখ্যান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আদিমতার বিভিন্ন প্রক্ষেপকে কেন্দ্র করে।

গল্পে দেখা যায়, কথক বহুদিন পর তার ভায়রা নির্মলের বাড়িতে উপস্থিত হলে সেখানে এক আড্ডায় তার সঙ্গে দেখা হয় সুরঞ্জনের। সুরঞ্জন কথকের পূর্বপরিচিত। আর তাদের পানাহারের আড্ডায় সুরঞ্জন এই স্ফিংকস প্রসঙ্গে এক গল্পের অবতারণ করে। দীর্ঘদিন আগে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়া সুরঞ্জনকে কাছে পেয়ে গল্পকথকের পুরনো কৌতুহল ঘনিয়ে ওঠে—

> "কিন্তু এতদিন পরে সুরঞ্জনকে পেয়ে যে কথাটা আমার মগজের মধ্যে সবথেকে বেশি পাক খাচ্ছিল, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তা আর কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না। তবুও স্থির করলাম, আজ জানতেই হবে সেই পনেরো বছর আগে সুরঞ্জন চাকরি ছেড়ে দিয়ে, কাউকে কিছু না জানিয়ে ডুয়ার্স থেকে পালিয়ে এসেছিল কেন? কেন ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সুরঞ্জন আমার সঙ্গেও আর যোগাযোগ রাখেনি?"[২১]

বস্তুত সুরঞ্জনের নামে একটা কেলেঙ্কারি সে সময় শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে। বহুদিন পর সেই পানাহারের আড্ডায় সুরঞ্জন বলতে শুরু করে স্ফিংকসের গল্প। প্রতিমা বড়ুয়ার 'যদি বন্ধু যাবার চাও ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে'—এই গানের অনুষঙ্গে সুরঞ্জন শুরু করে তার অভিজ্ঞতাকে গল্পের আদলে সেই আড্ডায় তুলে ধরার।

সুরঞ্জনের কথায় জানা যায়—

> "আর যেখানে গিয়ে পড়লাম সে প্রায় মধ্যযুগের একটা গ্রাম। অসাধারণ দারিদ্র্য, অসাধারণ বঞ্চনা এবং অসাধারণ শোষণ ভুটান পাহাড়ের নীল সীমানা এবং উপত্যকা ও অঞ্চলে ঘেরা একটা অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপের কাঠামোতে আটকানো। আমার সারের গুদাম, অফিস এবং বাসস্থান একই বাড়িতে।"[২২]

সেই বাড়ি আসলে নকুল সরকারের। নকুল সরকারের স্ত্রী আমাতীর হাতেই সুরঞ্জনের খাওয়ার ব্যবস্থা। নিঃসন্তান আমাতী এই গল্পের সেই উদ্দিষ্ট 'স্ফিংকস'। সুরঞ্জনের বর্ণনায়—

> "আমাতী কোনও অর্থেই সুন্দরী ছিল না। সে একটু লম্বা মেয়েমানুষ, তা আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। এখন বসা অবস্থায় দেখে বুঝলাম সে যথেষ্ট প্রশস্ত, লম্বা বলে দাঁড়ানো অবস্থায় তেমন বোঝা যায় না। পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত হ্রস্ব চুল আমাতীর ছড়ানো। মুখখানা চওড়া এবং দৃঢ়। চোখ, ঈষৎ মঙ্গোলীয় নাকে অন্য কোনও আদল যুক্ত হয়েছিল। তার ছোট নাকটি সামান্য ওল্টানো। ঠোঁট পুরু। চওড়া অনুচ্চ বুক প্রায় প্রশস্ত। সবকিছু মিলিয়ে একটা পাথুরে নিস্পৃহতা। ওইভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে আমার হঠাৎ স্ফিংকস-এর কথা মনে হল, যেন স্ফিংকস পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বসে আছে।"[২৩]

গল্পে উদ্দিষ্ট এই আমাতী সুরঞ্জনের মধ্যে এক কল্পজগৎ গড়ে তোলে—

> "এ সবই ফ্যানটাসি হতে পারে, যেমন ধর এখনও তার কথা মনে হলে আমার স্ফিংকসের কথা মনে পড়ে। স্ফিংকস কি কারও সেক্স্ ফ্যানটাসি হতে পারে? কে জানে?"[২৪]

কিন্তু আদতে এই আমাতীর মধ্যে ফুটে ওঠা স্ফিংকস সুরঞ্জনের মধ্যে সত্যিই যৌনতার আবেগ জাগিয়ে তুলছিল। আর তাই দশ-পনের বছর আগেকার সেই আমাতী তখনও পর্যন্ত সুরঞ্জনের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি—

> "...কিছুদিন আগে আমি বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখলাম ভিড়ের বাস থেকে জলপাইগুড়ি স্ট্যান্ডে নেমেছি। একেবারে হাঁফ ছেড়ে গা ঝাড়া দেওয়ার পর দেখি আমার কাঁধের অত সাধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগের বদলে ঝুলছে তার একটা নোংরা ব্রেসিয়ার।"[২৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 14
Website: https://tirj.org.in, Page No. 124 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলতাবাড়িতে একলা সুরঞ্জনের মনে আমাতী যে ঝড় তুলেছিল, সেই ঝড় ক্রমশ বাড়তে থাকে, যখন সদরে বিশেষ প্রয়োজনে নকুল সরকার যায় আর সুরঞ্জনের ঘরে ভাত নিয়ে আসে আমাতী নিজেই। অস্বস্তি শুরু হয় সুরঞ্জনের মধ্যে। অসাধারণ সুন্দরী না হলেও আমাতীর সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সুরঞ্জনকে বারবার বাধ্য করে তার দর্শনের জন্য, তাকে সম্ভোগের জন্য। আর তাই রাত্রিবেলা এক নির্দিষ্ট ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য, সারারাত নিজের ঘরের দরজা খোলা রেখেই সুরঞ্জন ঘুমায়। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত নকুল ফিরে না এলে আমাতী আবার আসে ভাত নিয়ে। ঠিক আগের দিনের মতোই সমস্ত ঘটনার হুবহু অনুকরণ ঘটে সেই দিনে—

> "একেবারে হুবহু আগের দিনের ঘটনাগুলো যেন পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। আমি খেতে পারছিলাম না ঠিকমত। আমাতী আগের দিনের মতোই দরজার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল, আর কিছু দেব আপনাকে? আমি তার উত্তরে আগের দিনের মতোই বললাম, আর একটু জল দাও। সে ভিতরে এসে গেলাসে জল ঢালতে গেলে আগের দিনের মতোই তার হাত কাঁপতে লাগল। আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম, তা সু কী কু, সে বোধ আমার ছিল না। কিন্তু তা ছিল তীব্র উত্তেজক।"[২৬]

আমাতীর এই প্রবল আকর্ষণ সুরঞ্জনকে ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো করে তোলে। আমাতী ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে সুরঞ্জনকে। সুরঞ্জন যতই চেষ্টা করতে থাকে আমাতীর আকর্ষণকে মনের মধ্যে ঠাঁই না দেওয়ার, ঠিক ততই অসম্ভব সব যৌন কল্পনায় শরীরী কুহক তৈরি হতে থাকে সুরঞ্জনের মনে। নকুল সন্ধে পর্যন্ত ফিরে না এলে সুরঞ্জনের মনে অস্থিরতা ও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত—

> "টেবিলের উপর রাখা আমার হাত স্পর্শ পেতেই আমাতীর হাতখানা ধরে ফেললাম। নেবা হ্যারিকেন লণ্ঠনটা ঠক্ করে টেবিলের উপরে পড়ার শব্দ পেলাম। আমাতীর হাত আমার হাতের মধ্যে পাতার মতো কাঁপছিল। ... আমাতী আমার শরীরের উপর ভেঙে পড়তে আমি তাকে দু-হাতে বেষ্টন করে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লাম। আমাতী তার সবল দু-খানা হাত দিয়ে আমাকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরল এবং চাপা গভীর আর্তনাদে আমাকে যেন আক্রমণই করল। ...তার পাথুরে শরীরের প্রশস্ত মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী একজোড়া স্তন অবিশ্বাস্য রকমের দৃঢ়, অসংখ্য ছোট ছোট চর্বিও পেশীর মালায় বৃত্তাকারে সাজানো। তার নিতম্ব ঠিক এর উলটো, যেন গিরিখাত, যেন পৃথিবীর প্রজাবৃদ্ধির যাবতীয় প্রাকৃতিক দায়িত্ব ওই গিরিবর্ত্মের।"[২৭]

ঘটনাক্রমে আমরা জানতে পারি, আমাতী প্রায় একবছর আগে থেকেই সুরঞ্জনকে পাওয়ার জন্য পেট-কাটি বুড়ির থানে পুজো দিয়ে আসছিল, দোমাসী যোগানের কাছে নানা ধরনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করেছিল, ঘটনার একমাস আগে থেকে সে সুরঞ্জনের খাবারে চিনি পড়া, তেল পড়া, নুন পড়া ইত্যাদি মিশিয়ে আসছিল, সুরঞ্জনের মাথায় দেওয়া নারকেল তেলের টিন বদলে ফেলেছিল দোমাসী যোগানের মন্ত্র পড়া টিনের তেলের সঙ্গে। মধ্যযুগীয় এক নারীর মতো এহেন ক্রিয়াকলাপ, শুধুমাত্র সম্ভোগ বা সন্তান ধারণের জন্যই নয়, এর মধ্যে মিশে আছে মানুষের এক বন্য আদিমতা, সুন্দরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও একাধিপত্য বিস্তারের জেদি লড়াই।

সময় ঘুরতে থাকলে সুরঞ্জনের মনে এরপর থেকে ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে এক রকমের বিষণ্ণতা ও নিজের প্রতি এক রকমের তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘৃণা। উদ্যমহীন সুরঞ্জনের শরীর একসময় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আমাতীর কাছে। আর ক্রমশ সুরঞ্জন জানায়—

> "উপসর্গটা স্থায়ী হয়ে গেল এবং দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর সময় ধরে আমার ঋজুতাকে যন্ত্রণায় পর্যবসিত করে শেষ পর্যন্ত একটা উত্তেজনাহীন নিষ্ক্রমণ। আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না, যার এ অভিজ্ঞতা হয়নি, তারা কখনও বুঝবেও না এ কী ভয়ঙ্কর, কী যন্ত্রণার।"[২৮]

সুরঞ্জন স্ফিংকস তথা আমাতীর কাছ থেকে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পারে না। শহুরে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় সে। ডাক্তারকে সবকিছু খুলে বলতে ডাক্তার তাকে মনোবিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলে। কিন্তু স্ফিংকসের অমোঘ টান নিয়তির মতো ফিরে আসতে বাধ্য করে সুরঞ্জনকে।

সুরঞ্জন আমাতীর থেকে দূরে চলে যেতে চাইলেও কালক্রমে সে ফের আমাতীর কাছেই পৌঁছয়। এইখানে 'স্ফিংকস' বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য আমাদের যথার্থ মনে হয়—

> "গ্রীক পুরাণে স্ফিংকস দানবী চরিত্র। তার দেহে আছে পাখা, তার দেহের উপরের অংশ নারীদেহ হলেও নিম্নের অংশ সিংহের। একটি ধাঁধাকে কেন্দ্র ক'রে দানবী স্ফিংকস থিবসে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। সকালে চারপায়ে, দুপুরে দুপায়ে, বিকালে তিনপায়ে হাঁটে কোন প্রাণী— এই ধাঁধা সে মানুষ দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করত। কোন মানুষই এই ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারত না, তার ফলে সে সে সমস্ত মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করত। ইদিপাস এই ধাঁধার সঠিক উত্তর হিসাবে মানুষের কথা বলে এবং সকাল-দুপুর-বিকালকে যথার্থভাবে মানুষের শৈশব যৌবন বার্ধক্যের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করে। সঠিক উত্তর দেওয়ার ফলে স্ফিংকস অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বত থেকে লম্ফ দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[২৯]

কিন্তু এই গল্পে আমাতী কিংবা সুরঞ্জন—মৃত্যু কারোরই হয় না। কিন্তু সুরঞ্জন ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা—

> "আমার শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী একসঙ্গে ঝিনঝিন করে উঠল। ওঃ সে কী ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি, যেন হাজার হাজার বিদ্যুতের ছুঁচ আমার শরীরের ভেতরে সোজা রান আর হেমে বিরতিহীন মেশিন চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ড, আমার অন্ত্র, আমার অন্ডকোষ সহ লিঙ্গ ক্রমশ ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে।"[৩০]

সুরঞ্জনও কি ক্রমশ স্ফিংকসের মতোই কোনো এক চরিত্রে পরিণত হতে যাচ্ছিল? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না থাকলেও, সুরঞ্জনের বক্তব্য বেশ ইঙ্গিতবহ—

> "চারদিকের গাছপালা ঘেরা সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি বোবা কান্নায় গুঙিয়ে উঠলাম। হাত দিয়ে বুক খামচে ধরতে গিয়ে দেখলাম আমার বুক নেই! দু-হাতে পেট চেপে ধরতে গিয়ে দেখলাম শূন্যে হাত ঢুকে যাচ্ছে আমার! আরও নিচে যেখানে আমার যাবতীয় অহংকার, আমার পৌরুষ—ক্রমশ গভীর কোনও খাদের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে! আমি প্রাণপণে দু-হাত দিয়ে টেনে ধরে চেষ্টা করতে লাগলাম সেই ভয়ংকর ঘটনাকে রোধ করতে!"[৩১]

এক রিকশাওয়ালার সহায়তায় সুরঞ্জন শেষ পর্যন্ত সেই মাস হিস্টিরিয়ার জায়গা থেকে ফিরে আসতে পারে কলকাতায়।

এইভাবে এক মানবীকে 'স্ফিংকস' হিসাবে উপস্থাপিত করে সুরঞ্জন কোনও ভুল করেছিল কিনা সেকথা বলার দায়ভার আমাদের নেই। কিন্তু পাহাড়ে ঘেরা নীল কুয়াশার মায়াঘোর লাগানো সেই অঞ্চলে আদিম বিভিন্ন সংস্কারকে অবলম্বন করে এক নারী অনেকাংশে 'স্ফিংকস'-এর মতোই গ্রাস করেছিল এক পুরুষকে। অবচেতনের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল এই জগতের মূল হলো সেক্স বা যৌনতা। ফ্রয়েড বা তাঁর উত্তরসূরি অ্যাডলার ইউং অথবা হ্যাভলক এলিস মানব সম্পর্কিত এইসব প্রথাবিরোধী ভাবনার অভিনব যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন, দেহ ও মনের একত্রে একই ব্যক্তিতে অবস্থান করা সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃত অর্থেই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মতো। যৌনতাকে আধার হিসেবে কেন্দ্র করে আমাতী ও সুরঞ্জনের এই গল্পে আমরা সেই পরিচয়ই পাই।

আলোচনার পরিশেষে আমরা তাই বলতে পারি, প্রেম ও যৌনতার ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন আলাদা করে সেরকম কোনো বিভেদরেখা টানেন নি। বর্ণনার ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন বেছে নিয়েছেন নিজস্ব মুন্সিয়ানা। সেখানে যেমন উন্মুক্ত বয়ান আমরা খুঁজে পাই, ঠিক তেমনই উন্মুক্ততার পাশাপাশি একরকমের কুহক তৈরি করেছেন অবলীলায় এই সমস্ত ভাষ্যের ক্ষেত্রে। গ্রামজীবন, প্রান্তিকায়িতের সুর, পাশাপাশি শহুরে শিক্ষিত সমাজের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা লাম্পট্য ও প্রেম উভয়েরই প্রকাশ পাওয়া গেছে আমাদের আলোচিত গল্পগুলিতে। যৌনতা, যৌনদৃশ্যের বর্ণনা এগুলিতে লেখক একাধারে যেমন ইঙ্গিতে বিশ্বাসী, অপরদিকে সেগুলির খোলামেলা বিবরণেও বিশ্বাসী। ভাষিক সংযমের কারণে দীর্ঘ বর্ণনা ও বিবরণ সত্ত্বেও এগুলি পর্ণগ্রাফি স্তরে পৌঁছয়নি কোনোসময়। যৌনতা ও প্রেমের পরিমণ্ডল রচনায়, একথাও ঠিক সমাজের শ্রেণিগত বিরোধ, অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র লড়াই, প্রান্তিক মানুষের বিবিধ অনুষঙ্গ ও উপাচার বারেবারে ফিরে এসেছে আলোচিত গল্পগুলিতে।

Reference:

১. ঘোষ, প্রসূন, ‘বাংলা ছোটোগল্পে প্রেমচেতনা : চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক কাল’, পুলককুমার সরকার (সম্পা), *শুভশ্রী,* ভালোবাসা : বাংলা কথাসাহিত্যে পর্ব ২, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২১০৩, ৪৮ বর্ষ, ২০০৯-১০, পৃ. ২৮০

২. চক্রবর্তী, তানিয়া, ‘অভিজিৎ সেন : জীবন, সৃষ্টি ও সাহিত্যভাবনা’, বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), *কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে,* সোপান, প্রথম প্রকাশ- জুন ২০১৮, কলকাতা- ০৬, পৃ. ৩১

৩. সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ৬৩

৪. তদেব, পৃ. ৬৮

৫. তদেব, পৃ. ৭১

৬. তদেব, পৃ. ৭৪

৭. দে, কাঞ্চন কুমার, ‘অভিজিৎ সেনের গল্পভুবন’, বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), *কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে,* সোপান, কলকাতা-০৬, জুন ২০১৮, পৃ. ১৫৭

৮. সেন, অভিজিৎ, *পঞ্চাশটি গল্প,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ২১৮

৯. তদেব, পৃ. ২৩৩

১০. সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১১৫

১১. তদেব, পৃ. ১২০

১২. তদেব, পৃ. ১২১

১৩. তদেব, পৃ. ১২১

১৪. মন্ডল, সুব্রত, ‘মানবদেহের গৌরব : কামনার দর্পণে প্রেম ; একটি অন্য অনুসন্ধান’, বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), *কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে,* সোপান, কলকাতা- ০৬, জুন ২০১৮, পৃ. ১৭৯

১৫. সেন, অভিজিৎ, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ২৪৭

১৬. তদেব, পৃ. ২৫১

১৭. তদেব, পৃ. ২৪৯

১৮. তদেব, পৃ. ২৯১

১৯. তদেব, পৃ. ২৯১

২০. তদেব, পৃ. ২৯২

২১. সেন, অভিজিৎ, *পঞ্চাশটি গল্প,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ৩৭০

২২. তদেব, পৃ. ৩৭৩

২৩. তদেব, পৃ. ৩৭৫

২৪. তদেব, পৃ. ৩৭৫

২৫. তদেব, পৃ. ৩৭৫-৭৬

২৬. তদেব, পৃ. ৩৭৭

২৭. তদেব, পৃ. ৩৮০

২৮. তদেব, পৃ. ৩৮৩

২৯. ঘোষ, প্রসূন, ‘অভিজিৎ সেনের ছোটোগল্প : একটি বিশ্লেষণ’, বিকাশ রায়, বিজয় কুমার স্বর্ণকার (সম্পা), *কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন : পাঠে বহুপাঠে,* সোপান, কলকাতা- ০৬, জুন ২০১৮, পৃ. ১৩৯

৩০. সেন, অভিজিৎ, *পঞ্চাশটি গল্প,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, পৃ. ৩৮৮

৩১. তদেব, পৃ. ৩৮৮